আখতার ইমামঃ সময়ের সাহসী পথিক

হোসনে আরা শাহেদ

মেয়েদের প্রথম ‘হল’-এর প্রথম প্রভোস্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের । প্রজ্ঞায় প্রখর, মননে গভীর, কর্মে অধীর। তদানীন্তন পুরুষ-প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে আখতার ইমাম (১৯১৭ – ২০০৯) একরাশ বিস্ময়—বাঙাল দেশের মেয়েও কিনা এমন দীপ্ত আর দীপ্র হতে পারে, হয়? শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, লেখক, সংগঠক, রূপকার—তাঁর বিশ্লেষণ ফুরানোর নয়।

ব্যক্তিত্বের মহিমায় মহিমান্বিত এ মানুষটির মধ্যে কঠোরতা আর কোমলতার মিশ্রণ। বৃহৎ জীবনাদর্শের জন্য ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন। দুর্গম পথে একাকী দীর্ঘ পথ ভ্রমণ। তাঁর কথা অনেক বলা যায়। কিছুই কল্পকাহিনী নয়। সব তথ্য এমনই সত্য যা একদিকে মন বেদনায় বিষণ্ন করে দেয়, অন্যদিকে মনে আনন্দ আর প্রেরণা জাগায়।

তরুণী বিধবা। শিশু তিন কন্যা। দুঃখকে সঙ্গী করে দুঃখকে জয় করে সন্তানদের নিয়ে তাঁর বিপদ-সংকুল পথ চলা। এ চলায় পেছানো নেই, থমকানো নেই, ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া বিরুদ্ধতা, বিরূপতা, বৈরিতা অষ্টপ্রহর আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে রেখেছে তাঁকে, কিন্তু তাঁর চলার গতি রুদ্ধ করতে পারেনি। তিনি জানতেন থেমে পড়া তাঁর জন্য হবে ভয়ঙ্কর, তিনি আপন ভাগ্য আপনি গড়ার কারিগর। ‘স্থিতিতে মৃত্যু’ কথাটি যদি সকলের বেলা সত্য হয়, তার জন্য তা সত্য সহস্রবার।

সাহসী পথিকের মতন চলেছেন একাই। এ চলায় তাঁর জুড়ি সত্যিই নেই। তাঁর উপমা তিনি নিজেই। তিনটি অবুঝ শিশুর জননী অনভিজ্ঞ এই নিঃসঙ্গ তরুণীর জীবন যেন রূপকথার এক অতি আশ্চর্য কাহিনী। অল্প বয়সের বিধবা, চারিদিকে যুদ্ধ আর অনিশ্চয়তা; কিন্তু তিনি ভীরু প্রদীপ শিখা হয়ে জীবন কাটাননি। নারী-হৃদয়ের বঞ্চনাকে বড়ো করে তুলে অশ্রুসাগর তৈরি করেননি; সহানুভূতি লাভের আশায় শোকগাথা রচনায় মন দেননি। যন্ত্রণাকে আত্মস্থ করে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, নীলকণ্ঠ হয়েই তিনি আকাশের নীলিমার সন্ধানে এগিয়েছেন; অনেক ঝড়-ঝাপটার মধ্যে দিয়ে পদচারণা শুরু করেছেন। অবশেষে অভীষ্ট লক্ষে পৌছতে পেরেছেন।

আখতার ইমাম আজ যেখানে পৌঁছেছেন, সেখানে পৌঁছানো সহজ নয়। কুসুমাস্তীর্ণ পথের মসৃণতায়-ও সহজ নয়। তিনি অনেক হেটেছেন। এ হাঁটায় অনেক কাঁটা। আত্মবিশ্বাস ছিলো তাঁর পাথেয়, আত্মবিশ্বাসই ছিলো তাঁর শক্তি। দৃঢ়চেতা এ মানুষটিকে জয়ী করেছে তাঁর দার্শনিক সত্তা, গঠনমুখী চিন্তা, প্রতিরোধ কাটিয়ে ওঠার মানসিকতা, নিরলস শ্রমের ক্ষমতা আর অসাধারণ দক্ষতা।

তিনি আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ জননী, আদর্শ মানুষ। আজকের দিনে তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব অকল্পনীয়; তিনি বিরল, তিনি বিশাল, তিনি অনন্য। শিক্ষাক্ষেত্র তাঁর চারণভূমি; গৃহকোণ, যে গৃহে পাখির ছানার মতো তিনটি শিশুকন্যা, তাঁর প্রাণ। নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন কন্যাদেরও। বৈরী পরিবেশের জন্য মনে কোনো তিক্ততা কোনো কালেই ছিলোনা, আজও নেই। নেই আত্মত্যাগ ও আত্মপ্রচারের অহমিকা। এমনটি সম্ভব হয়েছে প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ আর গভীর জীবন-দর্শনের জন্য।

আখতার ইমাম মাটির মানুষ, মাটির পৃথিবীর। এমন সময়ের মানুষ তিনি যখন মেয়েদের জন্য পরিবেশ ছিলো বড়ো বেশি কঠিন ও কঠোর ঢাকা তখনও প্রায় গ্রাম পুকুর, দীঘি, মাঠ-ঘাট, বন-জঙ্গল—তখনকার ঢাকা আজকের মতো নয়। হাঁটি হাঁটি পা পা করে তার যাত্রা। বলা চলে, খোয়া তখনও বিছানো হয়নি—ইট ভাঙার কাজ শুরু মাত্র। সেই দুঃসহ সময়ে নিজের পথ নিজে তৈরি করেছেন এই নিঃসঙ্গ মানুষটি। শেয়াল-ডাকা ঢাকায় তখন অনেক মানুষ-হায়না। নারী মুক্তি, নারী স্বাধীনতা, নারীপক্ষ, নারীবর্ষ—এসব তখন অচেনা শব্দপুঞ্জ। দুরতিক্রম্য পথে নিঃসীম অন্ধকারে আলোর আশায় ধীর স্থির পথ চলা তাঁর । তিনি সংগ্রামী এক নারী, তিনি আখতার ইমাম।

আখতার ইমাম প্রমাণ করেছেন, আপ ভালো তো জগৎ ভালো। নিজের সৎ ও মহৎ ইচ্ছার কাছে পার্থিব বিপত্তিও তুচ্ছ। নৈতিক শক্তির কাছে সমাজ নতি স্বীকার করতে বাধ্য—মেয়ে বলেই পরাস্ত হতে হবে এ ধারণা ভ্রান্ত। এই সত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছেন বলেই আখতার ইমাম সূর্যের মতন প্রদীপ্ত আর সর্বজন শ্রদ্ধেয়।

ঢাকা কলেজের প্রথম মহিলা অধ্যাপক তিনি, প্রথম বিভাগীয় প্রধান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আসেন, তখনও তিনি নবীন। কিন্তু সর্বত্রই তিনি কর্মে ও নিষ্ঠায়, অধ্যবসায় ও যোগ্যতায় স্থান করে নেন ছাত্র-ছাত্রীর অন্তরে। সজীব, প্রাণবন্ত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই শিক্ষিকার প্রতি সহকর্মীরাও ছিলেন শ্রদ্ধাবনত। তাঁর গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে এনে দিয়েছে দ্রুত সাফল্য। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছেন দ্বন্দ্ব, সংঘাত, বৈষম্য যেমন সত্য, তার চাইতে অধিক সত্য এসব অতিক্রমের নিরন্তর প্রয়াস এবং তাতে সফলতা লাভ। তাঁর সাহসের মূল হচ্ছে বিশ্বাস। এ বিশ্বাস যেমন নিজের প্রতি, তেমনি অপরের প্রতি। এ বিশ্বাস মানুষের প্রতি মানুষের । সমস্যা সংকটকে এড়িয়ে চলা নয়, মোকাবেলা করাই মানুষের কাজ। মানব কল্যাণের মূল প্রতিবন্ধক হচ্ছে ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ। এ বোধ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে জানলেই সমাধান সম্ভব। নিকৃষ্ট দর্শনকে অপসারণ করে উৎকৃষ্ট দর্শনকে লালন করা মানবধর্ম।

আখতার ইমামের জীবনাচরণ বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় তিনি তাত্ত্বিক আদর্শের ধারক নন। জীবন তাঁর কর্মময় সংকট থেকে উত্তরণ নয় শুধু, তাঁর ভূমিকা গঠনেরও। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মেয়েদের হল-এর প্রথম প্রভোস্ট। একেবারে শূন্য থেকে আরম্ভ। এ 'হল' গড়ে উঠেছে তাঁরই হাতে—একটি প্রবাল দ্বীপ যেভাবে গড়ে ওঠে, ঠিক তেমনি করে। এ যেন তাঁর দায়িত্ব পালন নয়, ব্রত পালন।

'হল'-এর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ছিলো তাঁর বড়ো আপন। তাদের নিয়েই তাঁর সার্বক্ষণিক আবর্তন। ছাত্রীদের কল্যাণ কামনায় ব্যাকুল তিনি, তাদের দিকেই তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছাত্রীরা তাঁকে ভক্তি করেছে, ভালোবেসেছে।

অবাক না হয়ে পারা যায় না। আজকের দিনে শিক্ষক দূরে সরে যাচ্ছেন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে, সন্তান বাবা-মা থেকে নেতাগণ জনগণ থেকে। পরিবারের সদস্যরাও স্বতন্ত্র, বন্ধুত্বের সম্পর্ক আজ বিপন্ন। অথচ একদিন অধ্যাপক আখতার ইমামের মাতৃরূপ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তাঁর কাছে টেনেছে। শাসন ও কাঠিন্যের মধ্যে ফল্গুধারার মতন প্রবাহিত ছিলো তাঁর যে স্নেহ ও কোমলতা, তা অভিভূত করেছিলো সকলকেই। ভেতরে স্নেহ না থাকলে ওপরের বলিষ্ঠতা দিয়ে গড়া যায় না। আখতার ইমাম তো মাত্রই একজন মানুষ গড়ার কারিগর ছিলেন না, ছিলেন একজন রূপকারও। বন্ধুর মতন কাছে এসেছেন দুঃসময়ে মায়ের মতন স্নেহ ছড়িয়েছেন ছাত্রীদের প্রবাস-জীবনে, যতো ভালোবাসা ছিলো তাঁর সবই উজাড় করে দিয়েছেন ছাত্রীদের । ছাত্রীরা ছিলো তাঁর অস্তিত্ব।

'হল'-এর বিশাল প্রাঙ্গণ ছিলো তাঁর আপন ভুবন। পরিবেশের শৃঙ্খলা, সার্বিক পরিচ্ছন্নতা আর ছাত্রীদের যশ, খ্যাতি, সুনামের জন্য ছিলো তাঁর সযত্ন তত্ত্বাবধান। বর্ণালী ফুলের বাগান মন কেড়েছে সকলের। একে নিয়ে বিমুগ্ধ উচ্ছ্বাস ছিলো ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক, অভ্যাগত ও দর্শনার্থীদের। এই বাগানে ছিলো তাঁর হাতের আদরের স্পর্শ। সবুজ লন, টলটলে পুকুর, লাল কাঁকরের পথ— সবই স্বপ্নের ফসল তাঁর। স্বপ্ন দেখেছেন তিনি তাঁর ছাত্রীদের নিয়ে, স্বপ্নপুরী করতে চেয়েছেন ছাত্রীদের আবাসকে; তারই জন্য ছিলো তাঁর প্রাণপণ প্রয়াস। মনে হয়নি, মনে করার কারণ ঘটেনি, এ কেবলি তাঁর কর্তব্য পালন; শুদ্ধ কোনো নীতিবোধ থেকে এ চেতনা উৎসারিত নয়, এর মূলে ছিলো যে আবেগ, তার শেকড় অনেক গভীরে। তাই তো বিস্ময় আর চমকের মিশ্রণ ঘটেছিলো তাঁকে ঘিরে। অনিন্দ্য চারিত্র্যের আখতার ইমাম এতোটাই ঠাই করেছিলেন মানুষের মনে।

তিনি সুন্দরী, তিনি সুন্দর। অপরূপ তাঁর মনন। শিল্পী যেমন রঙ তুলিতে নিপুণভাবে আঁকেন ছবি, কবি যেমন শব্দ আর ছন্দের বিন্যাসে গাঁথেন কবিতা, তেমনি আখতার ইমাম মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়ে তুলেছেন ছাত্রীদের প্রথম নিবাস । যতো সুষমা ছিলো তাঁর হৃদয়ে সবই ঢেলে দিয়েছেন এর শ্রী বর্ধনে। তাঁর এই মনন ও দর্শন ছিলো মূলধন 'হল' ও 'হল'-এর ছাত্রীদের বিকাশের । প্রাথমিক পর্যায়ের সেই ত্যাগ ও তিতিক্ষা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয় ভাষায়; এ উপলব্ধি করার বিষয়।

হ্যা, উপলব্ধিই বটে। আখতার ইমামকে উপলব্ধি করতে হলে পিছু ফিরে তাকাতে হবে, দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে অতীতে। দেখা যাবে এক তাপসী তরুণী কীভাবে বুকের রক্ত ঢেলে আগলে রেখেছেন মফস্বল থেকে আসা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রীদের। প্রথমে হাতে গোণা সংখ্যার, এ সংখ্যা একটু

একটু করে বেড়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে দাবি-দাওয়া, চাহিদা। আর এসব কিছুর প্রতিই ছিলো আখতার ইমামের পরম মমতা। চাওয়ার দরকার তেমন হয়নি, তাঁর মধ্যেই আপনা থেকে ছিলো প্রয়োজন পূরণের তাগিদ। তাঁর মায়ায় ভরা মন ছিলো সম্পদ ছাত্রীহল-এর ছাত্রীদের। আনন্দ কলতানে মুখর, নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষায় তৎপর ছাত্রীদের সঙ্গে খোলা মনে তিনি মিশেছেন; তাদের ঘরোয়া অনুষ্ঠানে সানন্দে হাজির হয়ে তাদের আনন্দ বাড়িয়ে তুলেছেন।

মনের চোখে আজ যাঁরা সেদিনের সেই ছাত্রী নিবাসটি দেখতে পান, তাঁরাই অনুভব করেন, এ ছিলো সত্যি এক মনোরম ভুবন যার প্রাণ ছিলেন আখতার ইমাম। হালকা রঙিন পাড়ের সাদা শাড়ি, কালো দীঘল চুলের রাশি, দীঘল দেহী গৌর বর্ণের আখতার ইমামের শুচিস্নিগ্ধ সৌন্দর্য আর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তাঁর শিক্ষার্থীদের একই সঙ্গে করেছে মোহিত ও শ্রদ্ধাবনত। এই রূপ রস গন্ধে ভরা পৃথিবীকে তিনি দিয়েছেন ভিন্ন ঐশ্বর্য যা পৃথিবীকে নতুন করে চিনতে শেখায়; পাথর-সমাজকে তিনি দান করেছেন নতুন দৃষ্টি যা নতুন ভাবনার জন্ম দেয়। সন্তানদের বক্ষে ধারণ করে, ছাত্রীদের সন্তানের মতন পালন করে এবং একই সঙ্গে জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রেখে ও কর্তব্যকর্মে অবিচল থেকে তিনি প্রমাণ করেছেন, তপস্যার জন্য অরণ্যে যেতে হয় না, সাধনার জন্য বর্জন করতে হয় না—বস্তুসর্বস্ব ও ভোগবাদী এ সমাজে বাস করেও মনের শক্তিতে, চিন্তার দীপ্তিতে, নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ে সর্বত্যাগী হওয়া যায়, হওয়া যায় অত্যাশ্চর্য ঐশ্বর্যের অধিকারী। হয়েছেনও তাই।

সুদীর্ঘ জীবন পথের নির্ভীক এই যাত্রী শেষ জীবনে একাকী থাকলেও তাঁর অবসর ছিল কোথায়? তিনি তো পরিপূর্ণ ছিলেন কানায় কানায়। তাঁর চেতনার জ্যোতি তাঁর মেধাবী সত্তাকে পথ দেখিয়ে গিয়েছে নিরন্তর। তাঁর সংস্পর্শে গেলেই মন নীলক্ষেতের সেদিনের সেই ছাত্রীনিবাসে ফিরে যেত—যার ঘাসে ঘাসে শীতের শিশির, যার এক প্রান্তে প্রভোস্ট-এর ছোট্ট বাংলোটির দেয়াল ঘেঁষা পুই পুদিনার পাশে তিনি এসে দাঁড়াতেন রোদের আশায়। সেই সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ ও ছাত্রী নিবাস আখতার ইমাম ছাড়া ভাবাই দায়।

অধ্যাপক আখতার ইমাম একটি প্রতিষ্ঠান। স্বপ্নে প্রাপ্ত কোনো মাদুলির গুণে নয়, উত্তরাধিকার সূত্রে করায়ত্ত সম্পদের কল্যাণে নয়, নিজের প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলেই তাঁর বিপুল অর্জন। তাঁর গৌরবে গৌরবান্বিত আমরাও। তিনি আজ আর আমাদের মাঝে নেই, এ সত্য নয়। আজও আমরা তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করি। আজও আমরা আছি তাঁরই ছায়ায়।